ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2006

ARTICLES

Dower in history and it's significance in Islamic law

The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study

The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years

The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh

Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review

Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective

The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study

The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872

Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995

Scanned with CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 03 2006

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Volume 03 2006

Published by
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
B T S Commercial Institute
Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:
Barendra Printing Press & Packaging
Sapora, Rajshahi

Subscription Rates
For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)
For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Dower in history and it's significance in Islamic law	1-10
Dr. Md. Gholam Kibria	The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study	11-22
Dr. Mohammad Abdul Hannan M. Ahsan Habib	The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years	23-36
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh	37-46
Dr. S M Solaiman	Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review	47-70
Md. Ahsan Kabir	Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective	71-84
Md. Delower Hossain	The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study	85-96
Zulfiquar Ahmed	The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872	97-112
Muhammad Ekramul Haque	Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961	113-124
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা	125-144
মো. আব্দুল আলীম	বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা	145-156
মো. আব্দুর রহিম মিয়া	ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা	157-178
মুসতাক আহমেদ মো. সাহাল উদ্দীন	সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান	179-200
সালমা আখতার খানম	শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	201-222
মোসা. সাঈদা আঞ্জু সারাওয়াত রশীদ	বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা	223-238
A F M Mohsin	Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995	239

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2006: **145-156**

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

মো. আব্দুল আলীম*

Abstract

Bangladesh is a river basin country. There are about 230 small and big rivers in the country. In the rainy season, these rivers become full to the brim. As a result, rivers cannot bear the strong flow of water. This also causes diluvion. On the other hand, the rivers carry a lot of sediment. Only twenty five percent of this sediment flows to the sea. This silt has created a high layer in the river bed which creates alluvion. As per law landowners who become landless due to erosion should own newly emerged or re-appeared lands in the river in his area. But once lands emerge, local influential grab the lands by any means. The land grabber first prepares fake deeds in connivance with a section of dishonest land administration employees and then capture newly emerged lands of poor and marginal farmers with the help of muscle power. It is difficult to take back the grabbed lands from the influential people because we have no idea on laws related to alluvion and diluvion of land. Local land officers in the respective areas do not survey and submit report after land alluvion and diluvion. If the landless poor can establish their right on Khas land of which is mostly alluvion land of the Char areas, its impact will be revolutionary in the effort for poverty alleviation in the country.

ভূমিকাঃ

জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, ভূমিকম্প, নদীর দু'পাড়ের ভাঙন, নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অনেক জমিই নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নদীর পাড় ভেঙে মাইলের পর মাইল নিশ্চিহ্ন করে দেয় ফসলভরা মাঠ, জনপদ, শহর। মানুষকে করে নিঃস্ব ও সহায় সম্বলহীন। নদীর বুকে হারিয়ে যাওয়া এই সব ভূমি প্রাকৃতিক নিয়মেই এক সময় জেগে ওঠে। আবার অন্য পাড়ে নতুন নতুন চর সৃষ্টি করে মানুষকে দেয় আশ্রয়। নদীর গতি প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতি। অসংখ্য নদী-নালার অবিরত ভাঙ্গা-গড়ার লীলাভূমি এদেশের প্রেক্ষাপটে শিকস্তি ও পয়স্তি সংক্রান্ত আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নতুন জেগে ওঠা চরের জমি নিয়ে প্রায়ই চরাঞ্চলে খুন-জখম ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ আইন শৃংখলার অবনতি ঘটে। যারা এর প্রকৃত অধিকারী তারাই থেকে যায় অধিকার বঞ্চিত। জীবন সংগ্রামের ইতিহাসে দুঃখ-শোকের অন্তহীন বেড়াজালে বন্দি ভূমিহীনদের ও প্রকৃত মালিকদের ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্য যুগোপযোগী ও শক্তিশালী আইন

* প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রণয়ন করা বা প্রচলিত আইনের যথাযথ সংশোধনী আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করাই বর্তমান প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

শিকস্তি ও পয়স্তি:

শিকস্তি এবং পয়স্তি শব্দ দুটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। শিকস্তি ও পয়স্তি শব্দগুলো সম্রাট শেরশাহ, আকবর ও তার রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "শিকস্তি" শব্দের অর্থ নদীর ভাঙ্গনজনিত ভূমিক্ষয় বা বিলুপ্তি। আর "পয়স্তি" শব্দের অর্থ নদী গর্ভে বালু সঞ্চয়ের কারণে নতুন জমি সৃষ্টি। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদী ভাঙ্গন বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে কোনো জোতজমা অথবা তার কোন অংশ যদি নদী অথবা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তাকে শিকস্তি (Diluvion) বলে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্র অথবা নদী ক্রমশ সরে যাওয়ার কারণে তীরবর্তী ভূমি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি কোন ভূমি সাগর বা নদীতে ধীরে ধীরে বা আকস্মিকভাবে জেগে ওঠে, অথবা নদীগর্ভে বিলীন হওয়া বা ভেঙে যাওয়া কোন ভূমি যদি পুনরায় জেগে ওঠে তবে সেক্ষেত্রে এরূপ ভূমিকে "পয়স্তি ভূমি" বলা হয়। শিকস্তি ও পয়স্তি সম্পর্কিত ধারণা প্রথম সৃষ্টি হয় রোমান আইনে যিশু খ্রিস্টের জন্মের অনেক পূর্বে।[১] Reformation in situ (স্বস্থানে পুনরুদ্ভব), Fordable (হেঁটে গমনযোগ্য) ও Accretion (পরিবৃদ্ধি) ইত্যাদি শব্দগুলো রোমান সভ্যতার অবদান। মূলত কোনো স্থলভাগ জলভাগে পরিণত হওয়াকে শিকস্তি এবং কোন জলভাগ স্থলভাগে পরিণত হওয়াকে পয়স্তি বলে। শিকস্তি ভূমির কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই তবে পয়স্তি ভূমিকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি শিকস্তির পর স্বস্থলে পয়স্তি ভূমি। (২) ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির সংলগ্ন জেগে ওঠা চর বা পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত ভূমি। (৩) প্রাকৃতিকভাবে জেগে ওঠা চরভূমি যা ইতিপূর্বে কখনো কোনো মৌজা ভুক্ত ছিল না। (৪) কৃত্রিম উপায়ে বাঁধ নির্মাণ বা যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্ট নতুন চরভূমি।[২]

প্রাচীন রোমান আইন থেকে শুরু করে পৃথিবীর বহু দেশে স্বস্থানে পয়স্তি একটি স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত নীতি। শিকস্তি জমি স্বস্থানে পুনরুদ্ভব হলে- (১) জমির আগের মালিক যদি তাতে তার স্বত্ব ত্যাগ না করে থাকে এবং (২) ঐ জমি যদি স্বস্থানে পুনরুদ্ভব বলে শনাক্ত করা যায়; তবে এই প্রকার স্বস্থানে পুনরুদ্ভব জমিকে "স্বস্থল পয়স্তি" (Reformation in situ) বলা হয় এবং তাতে আগের মালিকের স্বত্ব অক্ষুণ্ন থাকে।[৩] স্বস্থানে পয়স্তি বা পুনরুদ্ভব সংক্রান্ত এই নীতি লোপেজ বনাম মদন মোহন ঠাকুর মামলার

---

[১] আব্দুল মান্নান বনাম কুলদা রঞ্জন মাওয়ালী, ৩১ ডি.এল.আর (এ.ডি), (১৯৭৯), পৃ. ১৯৫।

[২] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০, এর ৮৬ ও ৮৭ ধারা।

[৩] লোপেজ বনাম মদন মোহন ঠাকুর, ১৩ এম. আই. এ, (১৯৭০), পৃ. ৪৬৭।

Scanned with CamScanner

রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব অধ্যাদেশের ৮৬(২) ধারা মতে শিকস্তি ভূমি যদি ৩০ বছরের মধ্যে "স্বস্থল পয়স্তি" হয় তবে মূল মালিক ওই ভূমি পাবে। এটাই দেশের প্রচলিত শিকস্তি আইনের সর্বশেষ সংশোধনী। যদিও ১৯৯১ সালে এক অধ্যাদেশ দ্বারা বলা হয়েছিল যে, ২০ বছরের মধ্যে ভূমি পুণর্জাগরণ হলে তা মূল মালিক বা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। অপরদিকে, সমুদ্র অথবা নদী যদি ক্রমশ সরে যায় এবং সেই কারণে তীরবর্তী জমি যদি মন্থর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমিতে সংলগ্ন ভূমির মালিক বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোন দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই ভূমি আইনের পরিভাষায় পরিবৃদ্ধিনীতি বা "Accrection" যা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারার বিষয়বস্তু।[৪] পরিবৃদ্ধি নিজের জমির সঙ্গেই হতে পারে বা অন্যের জমি এসে যুক্ত হতে পারে বা জমির সঙ্গে পলি যোগ হওয়ায় জমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। পূর্বের আইনে ঐ জমি পূর্বতন মালিকের মালিকানায় আসত। ১৯৭২ সালের ৭২ নং সংশোধনীতে পরিবৃদ্ধিজনিত ভূমি সরকারি খাস জমি হিসেবে গণ্য হবে। পরিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো স্বত্ব ত্যাগ বা বহাল রাখার প্রশ্ন নেই। যে কোনো জমি যদি ভেঙে এসে নদীপাড়ের কোনো জমির সঙ্গে পলি জমে যুক্ত হয়, তবে ওই নদী পাড়ের মালিক সেই জমির মালিক বলে কখনো গণ্য হবে না।[৫]

শিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির নিয়ন্ত্রণঃ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রজাস্বত্ব আইন চালু হওয়ার আগে শিকস্তি ও পয়স্তি বিষয়ক কয়েকটি আইন প্রচলিত ছিল। Alluvion and Diluvion Regulation 1825 এবং The Bengal Alluvion Lands Act 1920 এবং পরে ১৯৪৭ সনের Alluvion and Diluvion Law দ্বারা জমির মালিকানা নিয়ন্ত্রিত হতো।[৬] ১৮২৫ সনের এলুভিয়ন ও ডাইলুভিয়ন রেগুলেশনের ২ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, পলিমাটি পড়ে নদী বা সাগরের দিকে ভূমি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তবে তার মালিক কে হবে তা সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত প্রথা (usage) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত প্রথা না থাকলে তার বিধান ৪(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, যদি নদী বা সাগরের দিকে ভূমি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং মূল ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত হলে তবে তা মূল ভূমির বৃদ্ধি বলে বিবেচিত হবে। তবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পলিমাটি এত ধীর গতিতে হবে যেন একজন লোক অনুমান করতে না পারে যে

---

[৪] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৭(১) ধারা।

[৫] ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ (পি.ও. নং-১৩৭, ১৯৭২)।

[৬] মোঃ নূরুল হক, *ভূমি আইন ও আলোচনা* (ঢাকাঃ আইন গ্রন্থ প্রকাশনী, মে, ১৯৯১), পৃ. ১৭৫।

Scanned with CamScanner

কখন কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। একই রেগুলেশনের ৪(৩) ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি প্রকান্ড ও নৌ-চলাচলযোগ্য কোনো নদীতে চর বা দ্বীপ সৃষ্টি হলে তীর ও দ্বীপের মধ্যবর্তী চ্যানেল বছরের কোনো ঋতুতে না শুকায় তবে প্রতিষ্ঠিত প্রথা অনুসারে উক্ত ভূমি সরকার পাবে। আর ঐ তীর ও দ্বীপের মধ্যবর্তী চ্যানেল বছরের কোনো এক ঋতুতে শুকায় তবে সার ভূমি সবচেয়ে কাছাকাছি উক্ত রেগুলেশন অনুযায়ী তার বৃদ্ধি হিসেবে পাপ্ত হবে। ৪(৪) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, যদি অগভীর (Shallow) নদীতে চর পড়ে যার তলদেশে ব্যক্তি বিশেষের জলকর অধিকার (right of fishery) আছে তবে এক্ষেত্রে মূল মালিক উক্ত নদীর তলদেশের অধিকারী হবে।[৭] ওই প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারা বর্ণিত হয়েছে যে অন্য আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও এই ধারাদ্বয় যে বিধান আছে তা-ই শিকস্তি ও পয়স্তি আইন হিসেবে কার্যকর হবে। প্রজাস্বত্ব আইন প্রথম চালু হয় পটুয়াখালী জেলায়, ১৯৫৪ সালের ৫ই আগস্ট এবং সর্বশেষে চালু হয় ফরিদপুরে ১৯৬৬ সনের ৫ই আগস্ট।[৮] পরিশেষে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১৩৫ নং আদেশের মাধ্যমে ৮৬ ধারা এবং ৭২ ও ১৩৭ নং আদেশের মাধ্যমে ৮৭ ধারাটি বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন আদেশ জারি করেছেন। শিকস্তি জমির কর মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে ১৯৯১ সালের ৩ নং আধ্যাদেশমূলে এক সংশোধনী আনা হয়েছিল। সংশোধনীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদৌ কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। কেবল পুণর্গঠিত জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিষয়ে পূর্বের মালিক কিংবা তার উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। আবার একই সালের ৫নং অধ্যাদেশে আগের অধ্যাদেশ রহিত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইন মূলে শিকস্তি হওয়া জমির বিষয়ে অর্থাৎ ৮৬ ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়।

শিকস্তি ও পয়স্তি সম্পর্কে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানঃ

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ধারায় বলা হয়েছিল যে, কোনো জোতজমা অথবা তার অংশ বিশেষ যদি শিকস্তি হয়ে নদী অথবা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়, তবে ওই জোতজমার রায়ত শিকস্তি ভূমি বাবত হারাহারি খাজনা হ্রাস পেতে হকদার হবে। নদী বা সমুদ্রগর্ভে বিলীন অবস্থায় ওই জোতজমায়ে অথবা তার অংশ বিশেষ বিশ বছর পর্যন্ত রায়তের স্বত্ব দখল আছে বলে অনুমিত হবে। শিকস্তির বিশ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনর্গঠিত হলে রায়ত এ প্রকার পুণর্গঠিত জমিতে পুনর্দখল নেয়ার অধিকারী হবে এবং অনধিক ৪ বছর পর্যন্ত বকেয়া খাজনা আদায়ে তাতে স্বত্ববান থাকার

---

[৭] আব্দুল মান্নান বনাম কুলদা রঞ্জন মাওয়ালী, ৩১ ডি.এল.আর (এ.ডি), (১৯৭৯), পৃ. ১৯৫

[৮] যদুনাথ রায় বনাম পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ, ১৩ ডি.এল.আর (১৯৬১), পৃ. ৪৯৬।

Scanned with CamScanner

আইনগত অধিকারী হবে।[৯] মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১৩৫ নং আদেশের মাধ্যমে ৮৬ ধারার পুনর্গঠন সংক্রান্ত আইন বাতিল করে এক নতুন আদেশ জারি করেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, অন্য কোনো আইনে যা-ই থাকুক না কেন, শিকস্তি জমিতে শিকস্তির পর মালিকের সকল অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ বিলুপ্ত হবে এবং পয়স্তি ভূমি সর্বপ্রকার দায়হীন অবস্থায় সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে। তবে ১৯৭২ সালের ২৮শে জুনের আগে যদি কোনো জেগে ওঠা জমি ঐ তারিখের পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে অথবা কোর্ট তার অনুকূলে রায় দিয়ে থাকে তাহলে তা প্রজার জমি হিসাবে গণ্য হবে। তবে যেসব ভূমি ঐ তারিখের মধ্যে প্রজার বলে স্বীকৃত হয়নি বা কোনো কোর্ট কোনো প্রজার অনুকূলে রায় দেয়নি তা সরকারি খাস জমি হিসাবে গণ্য হবে। এতে আরো বলা হয়, এ রকম পয়স্তি জমি যদি শিকস্তির পর ২০ বৎসরের মধ্যে পুনর্গঠিত হয় তবে সরকার কর্তৃক পুনরায় বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় পূর্বতন মালিক পরিবারের জমি যদি ৬০ বিঘা (১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী) কম হয়, তাহলে তার দাবি অগ্রগণ্য হবে। সরকার কর্তৃক কোন বাঁধ নির্মাণ যদি প্রকার পুনর্গঠনের কারণ হয় তবে পুনর্গঠিত জমির উপর পূর্বের মালিকের কোন দাবি থাকবে না। এতে আরো বলা হয়, পয়স্তি জমি সম্পর্কে আদালতে অসমাপ্ত মামলা বাতিল হবে এবং পয়স্তি জমির মালিকানা দাবি করে ভবিষ্যতে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।[১০]

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৭ ধারায় পয়স্তি (Alluvion) সংক্রান্ত আইনটি "Incrementum latens" নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যার অর্থ সমুদ্র বা নদী যদি ক্রমশ সরে যায় এবং সেই কারণে তীরবর্তী ভূমি মন্থর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রোমান জুরিস্টগণ ল্যাটিন শব্দ Accessio বলতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা যোগপ্রাপ্ত নতুন ভূমিকে বোঝাতেন।[১১] Accession বা পরিবৃদ্ধি বলতে বুঝায় বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভূমির মালিকানা অর্জন করে সংলগ্ন ভূমির মালিকরা। বিখ্যাত লোপেজ বনাম মদনমোহন ঠাকুর মামলার বিচারপতি L. James (1870). বলেন,[১২] "Where there is an acquisition of land from the sea or a river by a gradual, slow and imperceptible means there from the supposed necessity of the case and the difficulty of having to determine year by year to whom an inch or a foot or a yard belongs the accretion by alluvion is held to belong to the owner of the

---

[৯] রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ধারা।

[১০] আব্দুল মান্নান বনাম কুলদা রঞ্জন মাওয়ালী, ৩১ ডি.এল.আর (এ.ডি), (১৯৭৯), পৃ. ১৯৫।

[১১] Lutful Kabir, *Land Laws in East Pakistan Vol. III* (Dacca: Law House, 1969), P. 214-215.

[১২] (১৮৭০), ১৩ এম.আই.এ, পৃ. ৪৬৭।

adjoining lands" ১৯৭২ সালের ৭২ ও ১৩৭ নং আদেশের মাধ্যমে এই ধারাটি সংশোধনের আগে বিধান ছিল যে, নদী বা সমূদ্র ক্রমশ সরে যাওয়ার কারণে এ তীরবর্তী ভূমি যদি ধীর গতিতে ক্রমশ বর্ধিত হয়, সেক্ষেত্রে ওই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমি তীরবর্তী ভূমির মালিক পাবে এবং বর্ধিত হারে ন্যায়সঙ্গত খাজনা সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু এ ধরনের বৃদ্ধি যদি সরকার বাঁধ নির্মাণের দ্বারা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করে তবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি তীরবর্তী ভূমির মালিক পাবে না। কিন্তু ১৯৭২ সালে ৮৭ ধারা সংশোধিত হওয়ার পর ওই ধারার বিধানাবলি আর বলবৎ নাই। ওই ৮৭ ধারাটি বাতিল করে তার পরিবর্তে সরকার আদেশ জারি করে বলেছেন অন্য যে কোন আইনে যা থাকুক না কেন সমুদ্র অথবা নদী যদি ক্রমশ সরে যায় এবং সেই কারণে তীরবর্তী জমি যদি মন্থর গতিতে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত জমি তীরবর্তী জমির মালিকের হবে না। এ প্রকার বর্ধিত জমি বাংলাদেশ সরকারের উপর সম্পূর্ণ দায়হীন অবস্থায় বর্তাবে। আরো বলা হয়েছে উক্ত সংশোধিত ৮৭ ধারা ১৯৭২ সনের ২৮শে জুন তারিখের আগে পয়স্তি বা পরিবৃদ্ধি ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত জমির বিষয়ে যদি সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা তৎকালীন প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইতমধ্যে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে তবে তা অপরিবর্তিত থাকবে। এছাড়া নতুন ভূমি/চর এর মালিকানা সম্পর্কে আদালতে অসমাপ্ত মামলা বাতিল হবে এবং ভবিষতে জেগে ওঠা নতুন চরের মালিকানা দাবী করে কোনো মামলা করা যাবে না।[১৩]

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ধারার সংশোধনী:

১৯৯৪ সালের ১৫ নং আইনমূলে শিকস্তি হওয়া জমির বিষয়ে অর্থাৎ ৮৬ ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। ১৯৯৪ সালের ১৩ জুলাইয়ের পূর্বে পুনরুদ্ভব সংক্রান্ত ভূমির ক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৩৫ নং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু যেসব ভূমি এখনও শিকস্তি রয়েছে তা সরকার দাবি করতে পারবে না। যেসব ভূমি ১৩ জুলাই ১৯৯৪ সালের পূর্বে শিকস্তি হয়েছে কিন্তু ৩০ বছরের মধ্যে যদি Reformation in situ হয় তবে পূর্বতন টেনান্ট এর উত্তরাধিকারীদের অধিকার বলবৎ থাকবে।[১৪]

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ (১) উপধারা মতে, কোন জোত বা জোতের অংশ শিকস্তির কারণে বিলুপ্ত হলে সেটুকু জোতের ভূমি উন্নয়নকর রাজস্ব কর্মকর্তা প্রচলিত বিধি অনুযায়ী মওকুফের ব্যবস্থা নিবেন যা ন্যায় সঙ্গতরূপে বিবেচিত হবে। একই সঙ্গে শিকস্তি জমির পরিমাণ উক্ত ভূমি মালিকের নামে বিধি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ

[১৩] ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রীয় অর্জন ও প্রজাস্বত্ব আইন (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ (পি.ও নং- ১৩৭, ১৯৭২)।
[১৪] ৫২ ডি.এল.আর, পৃ. ২৪০।

Scanned with CamScanner

করে রাখবে যেন ভবিষ্যতে যদি এ শিকস্তি স্থানে ভূমির স্বস্থান পুনরুদ্ভব ঘটে, তখন এ রেকর্ডই ওই ভূমি মালিকদের স্বত্ব প্রমাণের দলিল হিসাবে গৃহীত হতে পারে। ৮৬ (২) উপধারা মতে লিপিবদ্ধ হওয়ার ৩০ বছরের মধ্যে উক্ত ভূমি যদি পুনরায় স্বস্থানে পুনরুদ্ভব ঘটে, তবে সেই জোত বা তার অংশে পূর্বতন মালিক বা তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার আইনানুগ ভাবে স্বীকৃত থাকতে হবে। ৮৬ (৩) উপধারা মতে, পুনরুদ্ভব প্রাপ্ত ভূমিতে স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার ৮৬ (২) উপধারা মোতাবেক মালিকানার বিষয়টি কালেক্টর কর্তৃক স্থিরকৃত হবে। ৮৬ (৪) উপধারা মোতাবেক, এ আইনের অন্যত্র যাই বলা থাকুক না কেন, কালেক্টর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা সর্বপ্রথম এ ধরনের ভূমির দখল নিবেন এবং পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে এ দখল নেওয়ার বিষয়টি জানাবেন। সরকার আইন দ্বারা যেভাবে নির্ধারণ করবে, সেভাবে এবং একই সঙ্গে জরিপের মাধ্যমে পয়স্তি ভূমির একটি দাগ বা নকশা প্রস্তুত করবেন। ৮৬ (৫) উপধারা মতে, কালেক্টর ৪ উপধারা মোতাবেক জরিপ ও নকশা প্রস্তুতের ৪৫ দিনের মধ্যে পূর্বতন মালিক বা তার মৃত্যুতে আইনগত বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ওই শিকস্তি ভূমির বন্দোবস্ত দিবেন। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো বৈধ উত্তরাধিকারীর জমি, পয়স্তি জমিসহ ৬০ (ষাট) বিঘা জমির উর্ধ্বে হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভূমি সরকারের নিকট নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত হবে। ৮৬ (৬) উপধারা মতে, ৫ উপধারার বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ভূমিতে কোনো সেলামী লাগবে না তবে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হবে। ৮৬ (৭) উপধারা মতে, যদি সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অধীনে যান্ত্রিক বা কৃত্রিম উপায়ে কোনো ভূমি পয়স্তি হয় তবে ওই ভূমির ওপর পূর্বতন মালিকের মালিকানা থাকবে না।

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ A ধারায় বলা হয়েছে, ৮৬ ধারার ৪ উপধারা মোতাবেক কোনো কার্যক্রম গ্রহণের অর্থাৎ পাবলিক নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে এ কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাবে না অথবা কোনো আদালতে মামলা করা যাবে না অথবা কোনো আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না।

শিকস্তি ও পয়স্তি ভূমি ব্যবস্থাপনাঃ

কোনো মৌজার জমি আংশিক বা পূর্ণ শিকস্তি হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী বা তহসিলদাররা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ থানা/উপজেলা রাজস্ব অফিসারকে লিখিতভাবে জানাবেন। শিকস্তি হওয়ার সন, ভূমি মালিকদের নাম, পরিমাণ, খতিয়ান, দাগ, ওই এলাকার হোল্ডিংসহ সার্বিক তথ্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে লিপিবদ্ধ

থাকবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো এবং সার্ভেয়ারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মৌজা নকশায় লাল কালি দিয়ে শিকস্তি ভূমির রেখা অঙ্কন করবেন। প্রত্যেক বছর এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিকস্তি ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ হবে এবং রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। একইভাবে পয়স্তি হলে বা চর জাগলে সেখানেও এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে লিপিবদ্ধ থাকবে। ৮৬ ধারার বিধানাবলী কার্যকরকরণ, পয়স্তি ভূমির প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং একই সঙ্গে ৮৭ ধারা বিধান মতে পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ ও অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এলুভিয়ান ডিলুভিয়ান বা এ.ডি লাইন টানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রাজস্ব প্রশাসনের বিশেষ চাহিদার ভিত্তিতে জরিপের মাধ্যমে শিকস্তি ও পয়স্তি জমিতে এ.ডি. লাইন টানা হয়। এলুভিয়ন ডিলুভিয়ান টানার কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১. শিকস্তি ভূমি চিহ্নিতকরণ;

২. খাস জমি বণ্টন;

৩. চরাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং চরভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা হ্রাস;

৪. সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ে কোনো বিশেষ এলাকায় নকশা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণ;

৫. সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ।

জমি পয়স্তি বা স্বস্থানে পুনরুদ্ভব হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কানুনগো এবং সার্ভেয়ারের সহায়তায় পয়স্তি জমির দখল সরকার গ্রহণ করবেন এবং দিয়ারা জরিপের জন্য কালেক্টরের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করবেন। ইতিমধ্যে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে জমি একসনা বন্দোবস্ত দিবেন অথবা সরকারি নীতিমালা মোতাবেক স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়ার পদক্ষেপ নিবেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নদী ভাঙন এলাকার যেসব তহসিলদার কর্মরত তারা এ বিষয়গুলো ভালভাবে জানেন না। তাছাড়া ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজস্ব অফিসের উদাসীনতা শিকস্তি ও পয়স্তি নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ব্যাহত হচ্ছে।

শিকস্তি ও পয়স্তি ভূমি বন্দোবস্ত:

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারা অনুসারে নদী বা সাগরে পলি পড়ে জমির বৃদ্ধি ঘটলে যার জমির সাথে পরিবৃদ্ধি ঘটত সে ব্যক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক হতো যদি তার ৩৭৫ বিঘার উর্ধ্বে জমি না থাকত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্জন ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ দ্বারা ৮৭ ধারার সংশোধন ও পরিবর্তন করে বলা হয়, পলি পড়ার ফলে জমিতে পরিবৃদ্ধি পাক না কোনো উহা চূড়ান্তভাবে সরকারের ওপর ন্যস্ত হবে,

Scanned with CamScanner

জমির মালিক কোনো দাবি করতে পারবে না। ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত পুরোনো আইনগুলোর পরিবর্তন করে পুনরুদ্ভব ও পরিবৃদ্ধি সম্পর্কিত ভূমি সরাসরি খাস জমিতে পরিণত করে তা ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরনের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাস্তবে ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও দরিদ্র জনগণ খাসজমি ভোগ করতে পারে না। অব্যবস্থা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে দরিদ্র শ্রেণীর প্রাপ্য এইসব খাস জমি স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধভাবে ভোগদখল করে থাকে। এ.এল.আর.ডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট) নামক এক বেসরকারি সংস্থার তথ্য মতে, বিতরণকৃত মোট খাসজমির শতকরা মাত্র ১২ ভাগ রয়েছে ভূমিহীনদের কাছে। বাকি ৮৮ ভাগ খাসজমিই রয়েছে প্রভাবশালীদের দখলে। গাইবান্ধার চারটি উপজেলার ওপর এক সার্ভে পরিচালনা করে সমাজকল্যাণ সংস্থা নামে স্থানীয় এক এনজিও। যমুনা নদী পাড়ের জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা যায় সাঘাটা ও ফুলছড়ি উপজেলায় ২৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা ও ৪৫ শতাংশ নদীভাঙনে এবং ৩০ শতাংশ ভূমিগ্রাসীদের ভূয়া কাগজপত্রের কারণে দখলচ্যুত হয়ে ভূমিহীনে পরিনত হয়েছে।[১৫] অপর দিকে পাবনায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমতার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সুসংগঠিত হয়ে খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের কাজ শুরু করেছে। পাবনার চাটমোহর উপজেলার ডিকশি বিলের ৬শ একর খাসজমি ভূমিগ্রাসী জোতদাররা নামে বেনামে ভোগদখল করে আসছে। অথচ ভূমিহীনদের মধ্যে ডিকশি বিলের খাসজমি বন্টন করা হলে পাবনা জেলার অর্ধেক ভূমিহীন পূর্ণবাসিত হতো। দেশের প্রতিটি জেলায় পয়স্তি জমি সহ সকল প্রকার খাসজমি সঠিক ভাবে বন্দোবস্ত হলে দেশের দারিদ্র বিমোচনে তা সহায়ক হতো। ভূমিহীনদের ন্যায্য অধিকারের খাসজমিগুলো প্রভাবশালীমহল নানান কৌশলে ভোগদখল করে আছে।[১৬] দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের। তৃণমূল সংগঠন, সুশীল সমাজ, এনজিও সমূহ, সামাজিক সংগঠন সমূহ, পেশাজীবীদের সংগঠন, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ, রাজনৈতিক দল, স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ কেউই এই দায়িত্বের বাইরে নন। সরকারি হিসেব মতে, ২০০১ সাল পর্যন্ত নথিভূক্ত মোট খাস জমির পরিমাণ প্রায় ৩৩ লাখ একর। এর মধ্যে কৃষি খাসজমি প্রায় সাড়ে ৮ লাখ এবং অকৃষি খাসজমি রয়েছে ১৭ লাখ একর। এছাড়া প্রায় ৮ লাখ একর খাসজমি রয়েছে জলাভূমি হিসেবে। ২০০১ সাল পর্যন্ত ৬১টি জেলায় প্রায় ৮১

[১৫] *The Daily Star*, 7 September, 2005.

[১৬] যুগান্তর, ২১ ডিসেম্বর, ২০০৩।

হাজার একর খাসজমি সরকারিভাবে বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭৪ হাজার একর খাসজমি রয়েছে অবৈধ দখলদারদের হাতে।[১৭]

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনসহ দারিদ্র বিমোচনের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সরকারের প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে দ্রুত পর্যাপ্ত জমি বন্দোবস্ত প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খাসজমি পাবার সরকারি শর্ত সমূহঃ

- একান্নবর্তী বা যৌথ পরিবারের একাধিক সদস্যকে খাসজমি দেয়া হয় না।
- খাসজমির বরাদ্দ নিতে হবে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের নামে। তবে, বিধবা মহিলা অথবা বিপত্নীক হলে একক নামেও খাসজমির বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।
- কোনো পরিবারকে সর্বোচ্চ দেড় একর জমি দেয়া যাবে।
- উত্তরাধিকার সূত্রেও পরবর্তী বংশধররা খাসজমি ভোগ করতে পারেন। কিন্তু তারা এই জমি বিক্রি কিংবা হস্তান্তর করতে পারবেন না।
- কেউ যদি খাসজমি পাবার পর তা বিক্রি করেন, তাহলে সেই জমি পুনরায় খাসজমিতে পরিণত হবে।

উপজেলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটিঃ

২০০৩ সালের ৭ জানুয়ারি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উপজেলা 'কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১৮] এ কমিটি ভূমিহীনদের মাঝে উপজেলা পর্যায়ের সকল খাসজমি

---

[১৭] "অধিপরামর্শ", আরডিআরএস-বাংলাদেশ, ধাপ, রংপুর থেকে প্রকাশিত জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০০৩।

[১৮] কমিটি হবে নিম্নরূপঃ

সুষ্ঠুভাবে বিতরণের দায়িত্ব পালন করবে। বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে এ কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন করে সদস্যও এ কমিটিতে থাকবেন।

সুপারিশমালা বা প্রস্তাবনাসমূহ:

- চরের মাটি সুসংহত হওয়ার পর বা চাষ উপযোগী হওয়া মাত্র জরিপ করে নক্শা ও খতিয়ান প্রণয়নের জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বা দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসার এর নিকট জেলা কালেক্টর অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন যার প্রেক্ষিতে জরুরি ভিত্তিতে নতুন চর জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং রেকর্ড প্রকাশনা চূড়ান্তভাবে করা হয়। এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি রেডিও, টিভি ও দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশ ও প্রচার করে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।
- যত দ্রুত সম্ভব চর ও পললভূমির দিয়ারা জরিপ সম্পন্ন করতে হবে।
- পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত জমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।
- পয়স্তি জমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেত মজুর, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারি সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ স্কুল শিক্ষক ও এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।
- বণ্টনকৃত ও বণ্টনযোগ্য সমস্ত জমি, অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করা। এসব চিহ্নিত জমি গরিব ও ভূমিহীন জনসাধারণের মাঝে অবিলম্বে বণ্টন করা।

---

১. চেয়ারম্যানউপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।
২. সদস্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা।
৩. সদস্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা।
৪. সদস্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা।
৫. সদস্য বন বিভাগের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য)
৬. সদস্য চেয়ারম্যান টি.সি.বি.এ।
৭. সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
৮. সদস্য বিত্তহীন সমবায় সমিতির একজন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।
৯. সদস্য উপজেলা কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)।
১০. সদস্য স্থানীয় সৎ নিষ্ঠাবান ও জনহিতৈষী একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সাথে পরামর্শ করে মনোনয়ন দেবেন)।
১১. সদস্য স্থানীয় কলেজ অথবা হাই স্কুলের প্রধান একজন।
১২. সদস্য উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের একজন মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত)।
১৩. সদস্য একজন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি কর্তৃক মনোনীত)
১৪. সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

- খাসজমি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- খাসজমি বণ্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরিব জনগণের মাঝে বিতরণ করা।
- ভূমিহীন জনগণ যেন তাদের মাঝে বন্টনকৃত সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে এজন্য বণ্টন পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নাগরিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

উপসংহারঃ

২০১৫ সালের মধ্যে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি অর্ধেকে নামিয়ে আনার জন্য সরকারসহ বিভিন্ন সংস্থা জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নদীভাঙন ও উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার একর জমি সঠিক বন্দোবস্ত প্রদান ব্যতীত এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। দেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ খাসজমি চিহ্নিত করা হয়েছে, তা দিয়ে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে ০.৩৭ একর কৃষি খাসজমি এবং ০.৩৮ একর খাস জলাভূমি বণ্টন করা সম্ভব। আর সব ধরনের খাসজমি মিলিয়ে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১.৫২ একর বণ্টন করা সম্ভব।[19] জেলাভিত্তিক গড় বিবেচনায় প্রতিটি জেলার ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১.১৪ একর খাসজমি (খাস জলাভূমি বাদে) বণ্টন করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে তহশিলদারগণ ও রাজস্ব প্রশাসন ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ এর ৮৬ ধারার স্ব-স্থানে পুণরুদ্ভব ভূমিকে খাসজমির খতিয়ানভূক্ত করে কিংবা দখলকারীদের সাথে যোগসাজশ করে তাদের নামে রেকর্ডভূক্ত করে। এজন্য সরকারি চাকরিতে আলাদা ভূমি ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। শিকস্তি ও পয়স্তি ভূমির সঠিক বন্দোবস্তের লক্ষ্যে প্রয়োজন এই আইনের যথাযথ সংশোধনী যাতে জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে এবং সাথে সাথে স্থানীয় তহশিল অফিস, এসি ল্যান্ড অফিস দুর্নীতিমুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যায়।

---

[১৯] *বাংলাদেশের খাসজমির রাজনৈতিক অর্থনীতি*, এ.এল.আর.ডি, ২০০১।